কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

এক ৫
দুই ১৩
তিন ২৩
চার ৩৫
পাঁচ ৪৪
ছয় ৫৪
সাত ৬১
আট ৮০
নয় ৯৭
দশ ১০৬
এগারো ১১৫
বারো ১২৪
তেরো ১৩৪
চৌদ্দ ১৪৪
পনেরো ১৫০
ষোলো ১৬৫
সতেরো ১৭৭
আঠারো ১৯৫
উনিশ ২০৫
কুড়ি ২১৭
একুশ ২২৯

এক

শুধু দস্তুরমতো একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমতো এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

নজির অবশ্য আছে বটে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ- লীলার অঙ্গ। মুককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল; রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে, তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় নজির নাই। বলিতে গেলে গা ছম ছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল-এ একটা বিস্ময়! রীতিমতো!

অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল- নেতাইচরণ তাক লাগিয়ে দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ। তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল-প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল

বীরবংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানির আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিশের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনো সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিশ কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে-লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে। হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডাবেড়ির লোহা প্রত্যক্ষ; এ ছাড়া ফৌজদারি দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী-অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ-গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে।

ইহাদের উর্ধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিশ-রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র-নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিনপেশী, দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মতো। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ

কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া জোড় হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্গে ঠোঁটের রেখায় ঈষৎ একটু লজ্জিত হাসি।

ঘটনাটা এই-

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস-একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব; এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় চিরকাল জমজমাট কবিগানের পালা হয়। নোটনদাস ও মহাদেব পাল-দুই জনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্ণ বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল-প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ।

সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি নোটনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল-বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়-লোক না-জন না-জিনিস না, পত্তর না-সব ভোঁ-ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে-যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। লোকেরা হৈ হৈ করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল।

* * *

কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হইবে যে নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার

হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন- আসছে বার। বাবা সকল, আসছে বার। আসছে বার পাওনার আগেই তোমাদের দু-বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখনো তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্বাদ করিলেন- বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক।

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক জন অনেকেই সেখানে বসিয়াছিল-অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিশে আলোচনা হইতেছিল-মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয় লইয়া। মোহন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যান্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন-দাও না, তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা! দেখ এমন খাতক আর মিলবে না। এ খাতকের কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যান্ডনোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে-ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারপরেই মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নূতন একটা বায়না আসিয়া তাহার

প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা কবিগানের আসরে নোটনদাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে। আর যদি এখানে কোনোরকমে শেষের দিনের গাওনাটা না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণার কাঞ্চনমূল্যও ওজনে ভারী হইবে।

নোটন হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল-জয় মা চামুণ্ডা। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল-বোতলটা দেতো। বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল-'তা হলে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের তো আর দেরি নাই।'

নোটন হাসিয়া বলিল-আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি?

লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিল-আজ্ঞে, তা হলে এখানকার কি হবে? এখানকার কি হবে?

নোটন বলিল-নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভালো, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে। আমি তা হলে টাকা কিন্তু বেশি নোব।

লোকটা সোৎসাহে বলিল-আচ্ছা বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

-আজই। এখুনি। তোর সঙ্গে। এই ট্রেনে। লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

-দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

-আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা

ছিল না।

-কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল-এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকি টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব করে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলী ও দোহারদের বলিল- ওঠ! লোকটাকে বলিল-টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে। এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার এই শেষ।

* * *

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আফসোস করিতেছিল। আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনো সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল-সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল। তাহাকে বলিলে কি সে-ও যাইত না!

আসরের জনতা ক্রমশ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনো তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। মোহন্ত চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন- তারা, তারা!

নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না, -এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙা

জলাশয়ের জলের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর ভিজা পাঁকের মত জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা।

ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখনি পাইক লাঠিয়াল ভেজিয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত-নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতোই তাহারা লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। এই জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ-নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতোই সে দুর্মদ ও দুর্দান্ত-সে হঠাৎ মালকোঁচা সাঁটিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল-দুটো লোক। বলিয়া দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল- দোঠো আদমী হামারা সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ রাস্তা। আরে দশ কোশ তো দুলকিমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন দুলকি চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল-উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

-কেন রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

-জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়-বাড়ি যাই-ভাত খাই গিয়ে। ওরে নোটনদাস ভাগলবা, পালিয়েছে। কবি হবে না।

-না। মিছে কথা।

- মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল-বল হরি-! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতোই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল-হরি বো-

ল। অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণ-দাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

-কে? কে? কে রে বেটা?

-ধর তো বেটাকে, ধর তো! হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো বেটাকে।

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকে সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল- চোপ রও শালা!

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল-হাঁ-হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়। ও রাখহরি নয়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল-খবর-দা-র!

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল-মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ। রঙ তামাশা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল-জাড়া গাঁয়ে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল- "কি করে তুই বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা-চারদিকেতে বাঁশের বন! কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ড কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ড- সামনে আছে মুলোকুণ্ড করগে মুলো দরশন।" তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই, খুশিই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল-যা-যা-যাঃ! কিসে আর কিসে- ধানে আর তুষে।

-আরে, তুষ হলেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু'তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে- 'কবিয়াল ভাগলবা'; তা ঠাট্টা করে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগো না।

মোহন্ত এখন মোহান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এককালে তিনি